৪

স্থান -- দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি ও আলমবাজার মঠ

কাল -- মার্চ (১ম সপ্তাহ), ১৮৯৭

স্বামীজী যখন দেশে ফিরিয়া আসেন, মঠ তখন আলমবাজারে ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব। দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালীবাড়িতে এবার উৎসবের বিপুল আয়োজন হইয়াছে। স্বামীজী তাঁহার কয়েকজন গুরুভ্রাতাসহ বেলা ৯টা-১০টা আন্দাজ সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার নগ্ন পদ, শীর্ষে গৈরিক বর্ণের উষ্ণীষ। জনসঙ্ঘ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে -- তাঁহার সেই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দর্শন করিবে, পাদপদ্ম স্পর্শ করিবে এবং শ্রীমুখের সেই জ্বলন্ত অগ্নিশিখাসম বাণী শুনিয়া ধন্য হইবে বলিয়া। স্বামীজী শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র শির অবনত হইল। পরে রাধাকান্তকে প্রণাম করিয়া তিনি এইবার ঠাকুরের গৃহে আগমন করিলেন। সে প্রকোষ্ঠে এখন আর তিলমাত্র স্থান নাই। 'জয় রামকৃষ্ণ'-ধ্বনিতে কালীবাড়ির চতুর্দিক মুখরিত হইতেছে। শত সহস্র দর্শক লইয়া কলিকাতা হইতে হোরমিলার কোম্পানির জাহাজ বার বার যাতায়াত করিতেছে। নহবতের তানতরঙ্গে সুরধুনী নৃত্য করিতেছেন। উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষা, ধর্মপিপাসা ও অনুরাগ মূর্তিমান হইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদগণরূপে ইতস্ততঃ বিরাজ করিতেছে।

স্বামীজীর সহিত আগত দুইটি ইংরেজ মহিলাও উৎসবে আসিয়াছেন। স্বামীজী তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া পবিত্র পঞ্চবটী ও বিল্বমূল দর্শন করাইতেছেন। শিষ্য উৎসব-সম্বন্ধীয় স্বরচিত একটি সংস্কৃত স্তব স্বামীজীর হস্তে প্রদান করিল। স্বামীজীও উহা পড়িতে পড়িতে পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। খাইতে যাইতে শিষ্যের দিকে একবার তাকাইয়া বলিলেন, বেশ হয়েছে, আরও লিখবে।

পঞ্চবটির একপার্শ্বে ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণের সমাবেশ হইয়াছিল। গিরিশবাবু[১] পঞ্চবটীর উত্তরে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছেলেন এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া অন্যান্য বহু লোকের সঙ্গে স্বামীজী গিরিশবাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া এই যে ঘোষজ! বলিয়া গিরিশবাবুকে প্রণাম করিলেন। গিরিশবাবুও তাঁহাকে করজোড়ে প্রতিনমস্কার করিলেন। গিরিশবাবুকে পূর্ব কথা স্মরণ করাইয়া স্বামীজী বলিলেন, ঘোষজ, সেই একদিন আর এই একদিন। গিরিশবাবুও স্বামীজীর কথায় সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, তা বটে, তবু এখনও সাধ যায় -- আরও দেখি। এইরূপে উভয়ের মধ্যে যে-সকল কথা হইল, তাহার মর্ম বাহিরের লোকের অনেকেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর স্বামীজী পঞ্চবটীর উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত বিল্ববৃক্ষের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

সেদিন দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাড়ির সব্রত্রই একটা দিব্যভাবের বন্যা ঐরূপে বহিয়া যাইতেছিল। এইবার সেই বিরাট জনসঙ্ঘ স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও স্বামীজী লোকের কলরবের অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতে পারিলেন না। অগত্যা বক্তৃতার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া তিনি আবার ইংরেজ মহিলা-দুইটিকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের সাধনস্থান দেখাইতে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত ও অন্তরঙ্গগণের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিতে লাগিলেন।

বেলা তিনটার পর স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, একখানা গাড়ি দেখ -- মঠে যেতে হবে। অনন্তর আলমবাজার পর্যন্ত যাইবার ভাড়া দুই আনা ঠিক করিয়া শিষ্য গাড়ি লইয়া উপস্থিত হইলে স্বামীজী স্বয়ং গাড়ির একদিকে বসিয়া এবং স্বামী নিরঞ্জনান্দ ও শিষ্যকে অন্যদিকে বসাইয়া আলমবাজার মঠের দিকে আনন্দে আগ্রসর হইতে লাগিলেন।

---

[১] মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ

যাইতে যাইতে শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন:

কেবল abstract idea (শুদ্ধ ভাব মাত্র) নিয়ে পড়ে থাকলে কি হবে? এ-সব উৎসব প্রভৃতিরও দরকার; তবে তো mass (জনসাধারণ)-এর ভেতর এ-সকল ভাব ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়বে। এই যে হিন্দুদের বার মাসে তের পার্বণ -- এর মানেই হচ্ছে ধর্মের বড় বড় ভাবগুলি ক্রমশঃ লোকের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দেওয়া। ওর একটা দোষও আছে। সাধারণ লোকের ঐ সকলের প্রকৃত ভাব না বুঝে ঐ সকলে মত্ত হয়ে যায়, আর ঐ উৎসব-আমোদ থেমে গেলেই আবার যা, তাই হয়। সেজন্য এগুলি ধর্মের বহিরাবরণ -- প্রকৃত ধর্ম ও আত্মজ্ঞানকে ঢেকে রেখে দেয়, এ কথা সত্য।

কিন্তু যারা ধর্ম কি, আত্মা কি -- এ-সব কিছুমাত্র বুঝতে পারে না, তারা ঐ উৎসব-আমোদের মধ্য দিয়ে ক্রমে ধর্ম বুঝতে চেষ্টা করে। মনে কর, এই যে আজ ঠাকুরের জন্মোৎসব হয়ে গেল, এর মধ্যে যারা সব এসেছে, তারা ঠাকুরের বিষয় একবারও ভাববে। যাঁর নামে এত লোক হয়েছিল, তিনি কে, তাঁর নামেই বা এত লোক এল কেন -- এ কথা তাদের মনে উদিত হবে। যাদের তাও না হবে, তারাও এই কীর্তন দেখতে ও প্রসাদ পেতেও অন্ততঃ বছরে একবার আসবে, আর ঠাকুরের ভক্তদের দেখে যাবে। তাতে তাদের উপকার বই অপকার হবে না।

শিষ্য -- কিন্তু মহাশয়, ঐ উৎসব-কীর্তনই যদি সার বলিয়া কেহ বুঝিয়া লয়, তবে সে আর অধিক অগ্রসর হইতে পারে কি? অমাদের দেশে ষষ্ঠীপূজা, মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রভৃতি যেমন নিত্যনৈমিত্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাও সেইরূপ একটা হইয়া দাঁড়াইবে। মরণ পর্যন্ত লোকে ঐসব করিয়া যাইতেছে, কিন্তু কই এমন লোক তো দেখিলাম না, যে ঐ-সকল পূজা করিতে করিতে ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া উঠিল!

স্বামীজী -- কেন? এই যে ভারতে এত ধর্মবীর জন্মেছিলেন, তাঁরা তো সকলে ঐগুলিকে ধরে উঠেছেন এবং অত বড় হয়েছেন। ঐগুলিকে ধরে সাধন করতে করতে যখন আত্মার দর্শনলাভ হয়, তখন আর ঐ-সকলে আঁট থাকে না। তবু লোকসংগ্রহের জন্য অবতারকল্প মহাপুরুষেরাও ঐগুলি মেনে চলেন।

শিষ্য -- লোক-দেখানো মানিতে পারেন -- কিন্তু আত্মজ্ঞের কাছে যখন এ সংসারই ইন্দ্রজালবৎ অলীক বোধ হয়, তখন তাঁহাদের কি আবার ঐ-সকল বাহ্য লোক ব্যবহারকে সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে?

স্বামীজী -- কেন পারবে না? সত্য বলতে আমরা যা বুঝি, তাও তো relative (আপেক্ষিক) -- দেশকালপাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন। অতএব সকল ব্যবহারেরই প্রয়োজন আছে অধিকারিভেদে। ঠাকুর যেমন বলতেন, মা কোন ছেলেকে পোলাও-কালিয়া রেঁধে দেন, কোন ছেলেকে বা সাগুপথ্য দেন, সেইরূপ।

দেখিতে দেখিতে গাড়ি আলমবাজার মঠে উপস্থিত হইল। শিষ্য গাড়িভাড়া দিয়া স্বামীজীর সঙ্গে মঠের ভিতরে চলিল এবং স্বামীজীর পিপাসা পাওয়া জল আনিয়া দিল। স্বামীজী জল পান করিয়া জামা খুলিয়া ফেলিলেন এবং মেজেতে পাতা শতরঞ্জির উপর অর্ধশায়িত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বামী নিরঞ্জনান্দ পার্শ্বে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, এমন ভিড় উৎসবে আর কখনও হয়নি। যেন কলকাতাটা ভেঙে এসেছিল!

স্বামীজী -- তা হবে না? এর পর আরও কত কি হবে!

শিষ্য -- মহাশয়, প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়েই দেখা যায় -- কোন-না-কোন বাহ্য উৎসব-আমোদ আছেই। কিন্তু

কাহারও সঙ্গে কাহারও মিল নাই। এমন যে উদার মহম্মদের ধর্ম, তাহার মধ্যেও ঢাকা শহরে দিখিয়াছি -- শিয়া-সুন্নিতে লাঠালাঠি হয়!

স্বামীজী -- সম্প্রদায় হলেই ওটা অল্পাধিক হবে। তবে এখানকার ভাব কি জানিস? -- সম্প্রদায়বিহীনতা। আমাদের ঠাকুর ঐটেই দেখাতে জন্মেছিলেন। তিনি সব মানতেন -- আবার বলতেন, ব্রহ্মজ্ঞানের দিক দিয়ে দেখলে ও-সকলই মিথ্যা মায়ামাত্র।

শিষ্য -- মহাশয়, আপনার কথা বুঝিতে পারিতেছি না; মধ্যে মধ্যে আমার মনে হয়, আপনারাও এইরূপে উৎসব-প্রচারাদি করিয়া ঠাকুরের নামে আর একটা সম্প্রদায়ের সূত্রপাত করিতেছেন। আমি নাগমহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, ঠাকুর কোন দলভুক্ত ছিলেন না। শাক্ত বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলের ধর্মকেই তিনি বহুমান দিতেন।

স্বামীজী -- তুই কি করে জানলি আমরা সকল ধর্মমতকে ঐরূপে বহুমান দিই না? এই বলিয়া স্বামীজী নিরঞ্জন মহারাজকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ওরে, এ বাঙাল বলে কি?

শিষ্য -- মহাশয়, কৃপা করিয়া ঐ কথা আমায় বুঝাইয়া দিন।

স্বামীজী -- তুই তো আমার বক্তৃতা পড়েছিস। কই, কোথায় ঠাকুরের নাম করেছি? খাঁটি উপনিষদের ধর্ম তো জগতে বলে বেড়িয়েছি।

শিষ্য -- তা বটে, কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচিত হইয়া দেখিতেছি, আপনার রামকৃষ্ণগত প্রাণ। যদি ঠাকুরকে ভগবান বলিয়াই জানিয়া থাকেন, তবে কেন সর্বসাধারণকে তাহা একেবারে বলিয়া দিন না।

স্বামীজী -- আমি যা বুঝেছি, তা বলছি। তুই যদি বেদান্তের অদ্বৈতমতটিকে ঠিক ধর্ম বলে বুঝে থাকিস, তা হলে লোককে তা বুঝিয়ে দে না কেন?

শিষ্য -- আগে অনুভব করিব, তবে তো বুঝাইব। ঐ মত আমি পড়িয়াছি মাত্র।

স্বামীজী -- তবে আগে অনুভূতি কর; তারপর লোককে বুঝিয়া দিবি। এখন লোকে প্রত্যেকে যে এক একটা মতে বিশ্বাস করে চলেছে, তাতে তোর তো বলবার কিছু অধিকার নেই। কারণ তুইও এখন তাদের মত একটা ধর্মমতে বিশ্বাস করে চলেছিস বই তো নয়।

শিষ্য -- হ্যাঁ, আমিও একটা বিশ্বাস করিয়া চলিয়াছি বটে; কিন্তু আমার প্রমাণ -- শাস্ত্র। আমি শাস্ত্রের বিরোধী মত মানি না।

স্বামীজী -- শাস্ত্র মানে কি? উপনিষদ প্রমাণ হলে বাইবেল জেন্দাবেস্তাই বা প্রমাণ হবে না কেন?

শিষ্য -- এই-সকল গ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও বেদের মতো উহারা তো আর প্রাচীন গ্রন্থ নয়। আবার আত্মতত্ত্ব-সমাধান বেদে যেমন আছে, এমন তো আর কোথাও নাই।

স্বামীজী -- বেশ তোর কথা না হয় মেনেই নিলুম। কিন্তু বেদ ভিন্ন আর কোথাও যে সত্য নেই, এ কথা বলবার তোর কি অধিকার?

শিষ্য -- বেদ ভিন্ন অন্য সকল ধর্মগ্রন্থে সত্য থাকিতে পারে, তদ্বিশয়ের বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিতেছি না; কিন্তু আমি উপনিষদের মতই মানিয়া যাইব। আমার ইহাতে খুব বিশ্বাস।

স্বামীজী -- তা কর, তবে আর কারও যদি ঐরূপ কোন মতে খুব বিশ্বাস হয়, তবে তাকেও ঐ বিশ্বাসে চলে যেতে দিস। দেখবি -- পরে তুই ও সে একই জায়গায় পৌঁছবি। মহিম্নস্তবে পড়িসনি? -- 'ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব'[2]।

---

[2] ত্রয়ী সাংখ্যং পশুপতিমতং বৈষ্ণমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়াসামর্ণব ইব।।
-- শিবমাহিম্নঃ স্তোত্রম্